শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০৪

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, ওগো মা -'। ঘুম ভেঙে যাবার পরেও চোখ খুলছি না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি, চোখ খুললে যদি স্বপ্নটা মিলিয়ে যায়, যদি হারিয়ে যায় এই অপূর্ব রবীন্দ্রনাথ। জানালা জুড়ে ভোরের আলো, চোখ না খুলেও বুঝতে পারছি। ক'টা বাজলো? হঠাৎ সময়ের কথা মনে হতেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বুঝতে পারলাম আজ কাজে যেতে হবে না, আমি এখন ছুটিতে, স্বপনদার বাড়িতে। রবীন্দ্রসংগীত ভেসে আসছে লাউঞ্জরুম থেকে। মাত্র সাতটা বাজে। এর মধ্যেই উঠে গেছেন স্বপনদারা। বাইরের ঘরে এসে দেখি স্বপনদা বেলকনির টবের বাগানে পানি দিচ্ছেন। নীলিমাবৌদি রান্নাঘরে। জিভে পানি আসা সুগন্ধ বেরিয়ে আসছে রান্নাঘর থেকে। মনে হলো এমন অপরূপ সকাল দেখিনি অনেকদিন।

- 'গুড মর্নিং প্রদীপ। চলে আসো এদিকে।' স্বপনদা ডাকলেন বেলকনি থেকে। বেশ প্রশস্ত বেলকনি। থরে থরে সাজানো অসংখ্য টবে ফুটে আছে নানা রকম ফুল। এই গরমেও এত ফুল কোত্থেকে আসে জানিনা আমি। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে বাম দিকে চোখ ফেরালেই রেলস্টেশান দেখা যায়। বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে সাবার্বের রেসিডেন্সিয়াল রোড। এদেশে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় গাড়ি চলে প্রায় নিঃশব্দে। স্বপনদা গাছ ভালোবাসেন। শুধু গাছ কেন, সব ধরণের ভালো জিনিসই মনে হয় ভালোবাসেন এই মানুষটি। ভালোবাসার আশ্চর্য ক্ষমতা এই মানুষের। আজ ছুটির দিন নয়, অথচ স্বপনদা ছুটি নিয়েছেন। আমার জন্যই ছুটি নিয়েছেন তা বুঝতে পারছি, কিন্তু তিনি তা একবারও জানতে দিচ্ছেন না আমাকে। বাগানের কাজ শেষ হতে না হতেই নীলিমাবৌদি ডাক দিলেন রান্নাঘর থেকে।

রান্নাঘরের পাশেই ডাইনিং টেবিল। এই সকাল বেলায় টেবিলে সাজানো আয়োজন দেখে আমার চোখ কপালে ওঠে যাবার জোগাড়। নীলিমাবৌদির কি রান্নাতেও একটা পি-এইচ-ডি নেয়া আছে? কখন করলেন এতসব? কাল এতদূর থেকে এত ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসার পরে একটুও বিশ্রাম না নিয়ে এতসব আয়োজন করতে লেগেছেন। আমার খুব লজ্জা লাগছে, কিন্তু কিছু বলতেও পারছিনা। নীলিমাবৌদি বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা,
- 'আজ সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়বো। এখন ভালো করে খেয়ে না নিলে শেষে পথে কষ্ট পাবে।'

অনেকের কাছে শুনেছি, গল্প উপন্যাসেও পড়েছি বিদেশে গেলে মানুষ নাকি বদলে যায়, যন্ত্র

হয়ে যায়, আন্তরিকতা থাকেনা। কিন্তু সেরকম কোন কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিনা এখানে। বরং মনে হচ্ছে উন্নত দেশের উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশজ সংস্কৃতিই আরো প্রাণ পাচ্ছে এই প্রবাসীদের কাছে। নাকি আমি যাদের দেখছি তাঁরা আসলেই ব্যতিক্রম!

- 'তোমার নিজের কোন প্ল্যান আছে ঠিক কী কী দেখতে চাও, বা কোথায় কোথায় যেতে চাও?' স্বপনদা জানতে চাইলেন। আমার সেরকম কোন প্ল্যান নেই। সিডনি হারবার ব্রীজের নিউ ইয়ার্স ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখবো, সেটাতো কালকে। আজ যাওয়া যাক উলংগং এর দিকে।

গাড়ির বুটে চিপ্স, সফ্টড্রিঙ্কস আর একগাদা ফল বোঝাই করে চেপে বসলাম স্বপনদার গাড়িতে। চালকের আসনে স্বপনদা, পাশের সিটে নীলিমাবৌদি আর পেছনের সিটে সিডনিতে নতুন আসা আমি। গাড়ি চলছে আস্তে আস্তে। ঘুরছে প্যারামাটা সাবার্বের বিভিন্ন রাস্তায়। স্বপনদা বলছেন কোন্টা কী। আমার চোখ গাড়ির জানালায়। এদেশের প্রত্যেকটি সাবার্ব প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। স্কুল, শপিংসেন্টার, কমিউনিটিসেন্টার, সিনেমা থিয়েটার, স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম, সুইমিংপুল, পার্ক কোন কিছুরই অভাব নেই। হাসপাতাল মানুষের জন্যতো আছেই, পশুদের জন্যও আছে কয়েকটা। ২০০০ সালের অলিম্পিক হবে এখানে, এই প্যারামাটায়। বেশ কাছেই সম্পূর্ণ নতুন তৈরি অলিম্পিক ভিলেজ।

প্যারামাটা নদীর তীরে হোমবুশ বে। সিডনি সিটি সেন্টার থেকে মাত্র পনর কিলোমিটার পশ্চিমে। আজ যেখানে গড়ে উঠেছে অলিম্পিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অলিম্পিক ভিলেজ, সেখানে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ছিলো ময়লার ডিপো; শহরের সব ময়লা এনে ফেলা হতো। এখন সেখানে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে একটা আধুনিক রিসাইক্লিং সেন্টার। ময়লা পানি বিশুদ্ধকরন কারখানা। শত বছরের ময়লা যেগুলোকে সরিয়ে নেয়ার কোন উপায় আর নেই, সেগুলিকে পিরামিডের মতো করে জমিয়ে গাছ লাগিয়ে দিয়ে চমৎকার কৃত্রিম পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। এখন দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এই পাহাড়টা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়নি। প্রায় মাইল খানেক জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে আবাসিক এলাকা, খেলোয়াড় আর কর্মকর্তাদের থাকার জন্য। বেশ কয়েকটা ছোটবড় স্টেডিয়াম পাশাপাশি। এই সিডনি অলিম্পিক স্টেডিয়ামে দর্শক ধারণক্ষমতা এক লাখ দশ হাজার। অলিম্পিকের ইতিহাসে এপর্যন্ত এর চেয়ে বড় কোন স্টেডিয়াম তৈরি হয়নি। অলিম্পিক ইতিহাসের বৃহত্তম আটটি স্টেডিয়ামের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় সিডনির পরে আছে ক্রমানুয়ে লস এঞ্জেলেস, সিউল, মস্কো, আটলান্টা, মিউনিখ, মন্ট্রিয়েল ও বার্সিলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়াম।

সিডনি অলিম্পিক স্টেডিয়াম তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় সত্তর কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার। বাংলাদেশের টাকায় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। এই টাকার বেশির ভাগই অবশ্য এসেছে প্রাইভেট ফান্ড থেকে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দিয়েছে প্রায় সাতান্ন কোটি ডলার। গোটা অলিম্পিক গেইমে খরচ হবে প্রায় পাঁচশো কোটি ডলার। বাংলাদেশের টাকায় কত হবে তা হিসাব করার কোন কারণ আছে বলে মনে করিনা। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে কাজ শুরু হয়ে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এই স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে বসে আছে। এবছর মার্চের ছয়

তারিখে সিডনি অলিম্পিক স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়ে গেছে। স্টেডিয়ামের পাশ ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে স্বপনদা বলছিলেন স্টেডিয়াম সংক্রান্ত নানা কথা। পার্কিংলটে এখনো মিটার লাগায়নি, ফলে গাড়ি পার্কিং এখনো ফ্রি। তবে কিছুদিন পরে তা আর থাকবে না। বিরাট বিরাট হোটেল তৈরি হয়েছে অলিম্পিক ভিলেজের ভেতর। সুইমিংপুল এখন খুলে দেওয়া হয়েছে দর্শকদের জন্য। জনপ্রতি দুই ডলারের টিকেট লাগে সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে। এই পুলেই সাঁতার কাটবে পৃথিবীর সেরা সাঁতারুরা আর মাত্র কয়েকমাস পরেই। অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ইয়ান থর্প অলিম্পিকে সোনা জিতবেই এরকম আশা করেন বেশির ভাগ অস্ট্রেলিয়ান। দলে দলে লোক আসছে স্টেডিয়াম দেখতে। একটা নতুন রেলওয়ে স্টেশান তৈরি করা হয়েছে। সিডনি সিটি থেকে রেললাইন তৈরি করা হয়েছে এই অলিম্পিক ভিলেজ পর্যন্ত। দিনের মধ্যে অনেক বার ট্রেন আসা যাওয়া করে সিডনি সিটি সেন্টার থেকে। কোন ট্রেনই খালি থাকে না।

স্টেডিয়ামের ডিজাইন আর গঠন দেখলে অবাকই লাগে। ছাদ এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন স্টেডিয়ামের ছায়া বা চোখ ধাঁধানো সূর্যের আলো কোনটাই সরাসরি খেলার মাঠে না পড়ে। ছাদে দেয়া হয়েছে স্বচ্ছ পলিকার্বোনেটের তৈরি টাইলস। একেকটা টাইলসের ক্ষেত্রফল দশ বর্গ মিটার। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি কাঠামো। বৃষ্টি হলেও ভয়ের কোন কারণ নেই। পুরো স্টেডিয়াম ঢেকে ফেলার মতো ছাদ আছে এই স্টেডিয়ামে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ছাদ খোলা থাকবে। দরকার হলে সুইচ টিপে দিলেই হলো। গ্যালারির উপর থেকে স্বচ্ছ ছাদ এগিয়ে এসে ঢেকে দেবে ওপরটা। স্টেডিয়ামটা এত বড় যে খোলা অবস্থায় ছাদের ফাঁকা স্থান দিয়ে চারটা জাম্বো জেট নামতে পারবে একসাথে পাশাপাশি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক আলোবাতাসকে ব্যবহার করা হয়েছে সর্বোচ্চ দক্ষতায়। পেইন্টের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ ভাবে তৈরি রং যাতে পরিবেশদূষণ ঘটবে খুবই কমমাত্রায়। অলিম্পিক ভিলেজে লাগানো হয়েছে সারি সারি গাছ। অক্সিজেনের অভাব এখানে হবে না কখনো। পনেরো হাজার খেলোয়াড় আর কর্মকর্তাদের থাকার জন্য যে আবাসিক এলাকা তৈরি করা হয়েছে তার পুরোটাই সোলার এনার্জি চালিত। এত বিরাট আবাসিক এলাকার সমস্ত বিদ্যুৎ তৈরি হবে সূর্যের আলো থেকে। সিডনিতে বছরে গড়ে ৩৩৫ দিন সূর্যের আলো থাকে। আচ্ছা, অলিম্পিকের পরে কী হবে এই আবাসিক এলাকার? প্রাইভেট প্রোপার্টি হয়ে যাবে। যাদের টাকা আছে তারা কিনে নেবে এখানকার এক একটা বাড়ি।

এখনই যেহারে মানুষ আসতে শুরু করেছে অলিম্পিক ভিলেজ দেখতে, শুধুমাত্র ট্যুরিস্টদের কাছ থেকেই তো কোটি ডলার আয় করতে পারবে অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ অলিম্পিকের আগেই। স্বপনদারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকেট পাবেন সেন্টেনিয়াল পার্কের কর্মকর্তা হবার সুবাদে। সেন্টেলিয়াল পার্ক অলিম্পিক ভিলেজের কাছেই। স্টেডিয়াম এলাকা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পরেই শুরু হয়েছে সেন্টেনিয়াল পার্ক। স্বপনদা এই পার্কের সায়েন্টিফিক অফিসার। পার্কের মাঝখান দিয়ে কিছুদূর যাবার পরে স্বপনদা গাড়ি থামালেন। গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো কয়েকজন তরুণ তরুণী। স্বপনদার সাথে কথা বলার ধরণ দেখেই বুঝতে পারলাম স্বপনদা বেশ উঁচুপদে কাজ করেন এই পার্কে। বেশ হাসি মুখে নির্দেশ দিচ্ছিলেন স্বপনদা এই লোকগুলোকে। তারা গদগদ হয়ে ইয়েস ইয়েস বলছে দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো

আমার। একটা মেয়ে এবার কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দিলো স্বপনদাকে গাড়ির জানালা দিয়ে। স্বপনদা বেশ মনযোগ দিয়ে দেখলেন আর একটা সাইন করে দিলেন। সাইন করা কাগজটা হাতে পেয়ে মেয়েটার মুখ দেখে মনে হলো এত আনন্দ সে অনেকদিন পায়নি। হাত নেড়ে গাড়ি ছেড়ে দিলেন স্বপনদা। নীলিমাবৌদি জানতে চাইলে বললেন মেয়েটা বোটানিতে পি-এইচ-ডি করছে সিডনি ইউনিভার্সিটিতে। স্বপনদার পার্কে কিছু ডাটা নেবার জন্য পারমিশান চাইতে এসেছিলো। বাংলাদেশে মন্ত্রীর ভাই হলে এম-পি হোস্টেলে গিয়ে তাদের যেরকম অনুভূতি হয়, আমার হঠাৎ সেরকম অনুভূতি হলো এখানে।

হাইওয়েতে ওঠেই গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন স্বপনদা। ঘন্টায় একশ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে স্বপনদার বিশ্বস্ত টয়োটা। উলংগং সাউথ কোস্টের ছোট্ট একটা শহর। নিউসাউথ ওয়েলস্ এর তৃতীয় বৃহত্তম শহর বলা হলেও সিডনির তুলনায় এটা একটা গ্রামের সমান। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি হিসেবে নাম আছে উলংগং এর। পাহাড়ি ইলাওয়ারা এরিয়ায় উলংগং এর কাছেই আছে মাউন্ট কেমব্লা আর মাউন্ট মেইরা। রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড় আর সবুজ উন্মুক্ত প্রান্তর। অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃতি যে কী অদ্ভুত সুন্দর! উলংগং এর মেইন স্ট্রিট ক্রাউন স্ট্রিট। এখানে গাড়ি থামিয়ে একটা রোড ডাইরেক্টরী কিনলেন স্বপনদা। আমরা যাবো কায়ামা বীচের দিকে। রাস্তা ভুল করলে অনেকটা সময় নষ্ট হবে, তাই ডাইরেক্টরী সাথে থাকা ভালো। উলংগং ছোট শহর হলেও দারুণ সুন্দর। দুটো বীচ আছে এখানে, নর্থ বীচ আর সিটি বীচ। নর্থ বীচ সার্ফিং এর জন্য বিখ্যাত। সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়ানোর নাম সার্ফিং। কাজটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভয়ানক বিপজ্জনক। ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে অনেকেই বড়শিতে মাছ ধরে এখানে। মাছ ধরার জন্য নাকি লাইসেন্স নিতে হয় এদেশে। বেশ কিছু আর্ট গ্যালারিও আছে এই সৈকত শহরে।

একটু পরেই আবার চলতে শুরু করলাম আমরা। নীলিমাবৌদি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন গাড়িতে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাচ্ছি চারপাশে। অস্ট্রেলিয়াকে নতুন করে ভালো লাগতে শুরু করেছে। আকাশ ঝকঝকে নীল। রাস্তা আস্তে আস্তে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। পাহাড়ী পথ শুরু হয়েছে মাঝে মাঝে। একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাচ্ছে রাস্তা থেকেই। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে একদম সাগরের কাছে। এরকম একটা রাস্তা ধরে গাড়ি নিয়ে গেলেন স্বপনদা। রেইন ফরেস্টের ভেতর ছোট বিশ্রামাগার। পিকনিক স্পট। গাড়িপার্কিং, বাথরুম, ছোট্ট রেস্টুরেন্ট, সবকিছু আছে এখানে। সবচেয়ে বিস্ময়কর যেটা সেটা হলো সাগর এখান থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে। জায়গায় জায়গায় পাহাড় কেটে বেলকনির মতো করে রেলিং দেয়া আছে। সেখানে গিয়ে নিচের দিকে তাকালে গা শিরশির করে ওঠে। নিচেই সাগরের ঢেউ। নিচে মানে অন্তঃত একশ মিটার নিচে। সাগরের পানি আর আকাশ মিলে মিশে নীল হয়ে আছে এখানে। সৌন্দর্য দেখার ব্যবস্থা না থাকলে সে সৌন্দর্যের মূল্য কী? এ নিয়ে দার্শনিক বিতর্ক করা যেতে পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দেশের সমুদ্র পাহাড় মিলিয়ে সৌন্দর্য কম নেই, তবে আমাদের দেখার সুযোগ এরকম করে নেই বলেই আমরা শুধু 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি' কেবল মুখস্থ করতে থাকি, কখনো খুঁজে পাইনা।

কায়ামা বিচে পৌঁছাতে প্রায় একটা বেজে গেলো। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে সৈকতকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মোটামুটি আয়তনের একটা টাউনশিপ। আকাশ এখানেও ঝলমল। বেশ কিছু নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে এদিকে। অবসরপ্রাপ্তরা অনেকেই এদিকে বাড়ি কিনে বাস করতে পছন্দ করছেন আজকাল। বাঁধানো সাগরপাড়ে ক্যারাভানের সারি। ক্যারাভান মানে গাড়ি কাম বাড়ি। অনেকে নিজেদের ক্যারাভান নিয়ে এসে কাটিয়ে যায় এখানে কয়েকদিন। আবার অনেক ক্যারাভান ভাড়াও পাওয়া যায় এখানে। গাড়ি পার্ক করে হাঁটতে শুরু করলাম সাগরের পাশ ঘেঁষে বাঁধানো রাস্তা ধরে। অনেকেই পায়ে চাকাওয়ালা জুতা পরে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে আমাদের পাশ কাটিয়ে। রাস্তার পাশেই সবুজ ঘাসের লন। সেখানে রোদ চশমা লাগিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সারি সারি মানুষ। তাদের পরনে সামান্য একটু নেংটি ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। এই বীচে নেংটা হওয়া যাবে না, এই নিয়মটা না থাকলে বোধহয় এই নেংটিটুকুও অবশিষ্ট থাকতো না। মনে হলো আমারও রোদচশমা নিয়ে আসা উচিত ছিলো। কালো চশমাটা রোদের পাশাপাশি চক্ষুলজ্জা নিবারণের কাজও করে এখানে।

স্বপনদা হঠাৎ ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে হাত পা শূন্যে ছুড়তে লাগলেন। আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে তাকাতেই নীলিমাবৌদি বললেন,
- 'ব্যায়াম করছে। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়েছে তো।' আমি আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু স্বপনদা যেভাবে ঘাসে শুয়ে হাত পা ছুড়ছেন, বাংলাদেশ হলে লোক জমে যেতো আর মৃগীরোগী মনে করে জুতো শুঁকাতেও আসতো অনেকে। কিন্তু এখানে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। স্বপনদার হাত ছোঁয়া দূরত্বে যে মহিলাটি শুয়ে আছেন কালো চশমায় চোখ ঢেকে, তিনিও মনে হয় একবারও তাকাননি স্বপনদার দিকে।

একটু পরেই শেষ হলো স্বপনদার ব্যায়ামপর্ব। কিছুদূর যেতেই দেখা গেলো একজায়গা থেকে একটু পরপর পানি উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কাছে যেতেই দেখলাম এই সেই বিখ্যাত ব্লোহোল। প্রায় একশ ফুট ব্যাসার্ধের একটা গর্ত এখানে। সাগরের পানি ঢেউয়ের সাথে এখানে এসে পড়ে আর গর্ত দিয়ে সবেগে উঠে যায় আকাশের দিকে প্রায় দুশো ফুট। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক শক্তিতেই এই প্রক্রিয়া চলে। বেশ আকর্ষণীয় এই প্রক্রিয়া দেখতে সুবিধা হবার জন্য জায়গাটায় লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। খুব কাছে গেলে নিচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে একটা সীমানার পরে আর যেতে দেয়া হয়না কাউকে। খুব বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ নাকি মারাও গেছে এখানে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ব্লোহোলের সৌন্দর্য।

সাগরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ার কারণেই হয়তো, ক্ষিধে পেয়ে গেলো খুব। গাড়ি নিয়ে ফেরার পথে কে-এফ-সিতে ঢুকে খেয়ে নিলাম একপেট। এদেশে হাইওয়েতে ফাস্টফুডের কোন বিকল্প নেই। খাবারের মানও বেশ ভালো আর দামও কিছু বেশি নয়। ফেরার পালা এবার। ফেরা মানে উলংগং এর দিকে ফেরা। উলংগং এর কাছে একটা বৌদ্ধমন্দির খুব বিখ্যাত এখানে।

রাস্তা থেকে ভেতরের দিকে কিছুদূর গেলে বিরাট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে এই বৌদ্ধ মন্দির। ফকুয়াংসান নান্ টিয়েন টেম্পল। ইন্দোনেশিয়ান এক বৌদ্ধধর্মালম্বী ব্যবসায়ী মিলিয়ন

ডলার খরচ করে এখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। মন্দিরের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে স্বপনদা আর মন্দিরের ভেতর যেতে রাজী হলেন না। তিনি আগে এই দেখেছেন বলে এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে চাইলেন। আমি আর নীলিমাবৌদি চললাম মন্দিরের ভেতর। চমৎকার ফুলের বাগান ঘেরা প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতে হয় মন্দিরের প্রধান চত্বরে যাবার জন্য। পাহাড়ের ওপরে মূল মন্দির। বৌদ্ধমন্দিরগুলো খুব গাঢ় রঙে রাঙানো থাকে কেন জানিনা। বেশ উজ্জ্বল। এখানে যারা আসেন সবাই খুব ধার্মিক এটা ভাবার কোন কারণ নেই। মন্দিরটা সুন্দর বলেই দেখতে আসেন অনেকে। অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়ে থাকে এখানে। মন্দিরে কাজ করে আর বিনিময়ে থাকতে আর খেতে পায়। কিছু শিক্ষাও নাকি পায়, তবে সে শিক্ষা কেবল ধর্মীয় শিক্ষা বলেই মনে হলো আমার। মন্দিরের ভেতরের চত্বরে ঢুকতে হলে জুতো খুলে ঢুকতে হয়। ভেতরের স্থাপত্য মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো সুন্দর। ছবি তোলা নিষেধ এখানে। চমৎকার একটা মিউজিয়াম আছে মন্দিরের ভেতর। নানারকম বৌদ্ধমূর্তিতে ঠাসা এই মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য একটা প্রবেশমূল্য দিতে হয়। অহেতুক ভীড় কমাবার জন্যই হয়তো এই ব্যবস্থা। ছোটবড় মোটাপাতলা অনেক পাথরের বুদ্ধ থরে থরে বসে আছেন প্রদর্শনী হয়ে। পাথরের হলেও এদের উপার্জন মনে হচ্ছে অনেক সুস্থ সবল মানুষের চেয়ে বেশি। প্রত্যেকটা মূর্তির সামনে আশে পাশে হাতে পায়ে পড়ে আছে অসংখ্য ডলার, মুদ্রায় আর নোটে। ঘুষ প্রথাটা হয়তো অত্যন্ত পুরোনো একটা প্রথা। মানুষ দেবতাদের টাকা পয়সা দিয়ে হলেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়। দেশে থাকতে ট্রেনে কালুরঘাট ব্রীজ পার হবার সময় দেখেছি অনেকে পকেট থেকে পয়সা বের করে কপালে ঠেকিয়ে ফেলে দিচ্ছে কর্ণফুলিতে। এই পয়সা ভালো কাজে চাইলে কেউ দেবেনা। নীলিমাবৌদিও দেখলাম একটা মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাগ খুলে কিছু কয়েন বের করে ছুঁড়ে দিলেন। বিনিময়ে কী চাইলেন কে জানে।

বিকেল পাঁচটায় মন্দিরের গেট বন্ধ হয়ে যায়। আমরা পাঁচটা বাজার কিছু আগে বেরিয়ে এলাম। মন্দিরের পাশে বেশ বড় একটা পদ্মবন আছে। সেদিকে ঘুরে দেখলাম কিছুক্ষণ। মন্দিরের বাইরেও বেশ কিছু বুদ্ধমূর্তি আছে। গৌতম বুদ্ধ নিজেকে কখনো ভগবান বলেননি, ভগবানে তাঁর বিশ্বাসও ছিলো না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা গৌতমকেই ভগবান বানিয়ে ফেলেছেন। গৌতম বলেছেন যেরকম কাজ সেরকম ফলের কথা। আর বর্তমানে অনেক বৌদ্ধ কাজের ওপর নির্ভর না করে গৌতমের কাছেই সব কিছু চাইতে শুরু করেছে। মন্দিরের শ্রমণ আর ভিক্ষুদের শারীরিক স্থূলতা দেখলে মনেই হয়না এঁরা কোন ধরণের বৈরাগ্যের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন।

স্বল্পমেয়াদী ঘুম থেকে উঠে স্বপনদার চায়ের তৃষ্ণা পেয়ে গেলো। বললেন, ‘চলো, সুধীর স্যারের বাসা থেকে চা খেয়ে আসি।’ নীলিমাবৌদি বললেন, ‘চলো। তবে শুধু চা খেয়ে তুমি আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।’ স্বপনদা বললেন, ‘যাবো, এক কাপ চা খাবো, আর চলে আসবো।’ সুধীর স্যার এখানে উলংগং ইউনিভার্সিটির একাউন্টিং এর প্রফেসর। বাংলাদেশে থাকতে চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন। নীলিমাবৌদির সরাসরি শিক্ষক। উলংগং এর আবাসিক এলাকা বেশ নির্জন। মানুষজন খুব বেশি নেই। একটা রেল ব্রীজের নিচে গাড়ি পার্ক করে ছোট্ট রাস্তাটি পার হলেই সুধীর স্যারের বাড়ি। গাছপালা ঘেরা বেশ সুন্দর বাড়ি।

নারকেল গাছ, কলাগাছ দেখে হঠাৎ বাংলাদেশের কোন বাড়ি বলে মনে হয়।

- 'বাড়িতে কেউ নেই? গাছে একটু জলটলও দেয়া হয়না!' বলতে বলতে স্বপনদা ঢুকে গেলেন বাড়ির পেছনের দিকের উঠানে। তাঁর পেছনে আমি। সাথে নীলিমাবৌদি।

সুধীর স্যার উঠানে একটা চেয়ারে বসে রিসার্চ পেপার দেখছিলেন। আমাদের দেখে হৈ চৈ করে অভ্যর্থনা করতে শুরু করলেন।
-আরে জামাই। এতদিন পরে শ্বশুরকে মনে পড়লো! এসো এসো।

নীলিমাবৌদির সূত্রে স্বপনদা সুধীর স্যারের জামাই হলেও মনে হচ্ছে শ্বশুর জামাইয়ের সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুত্বের। আমার দিকেও হাত বাড়িয়ে দিলেন সুধীর স্যার। আমাদের কথা শুনে বাড়ির ভেতর থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন শ্যামলী ম্যাডাম। সুধীর স্যারের স্ত্রী। শুরু হয়ে গেলো আপ্যায়ন। কে বলবে এটা বাংলাদেশ নয়! কথায় কথায় জানা গেলো শ্যামলী ম্যাডামের বাড়ি চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের আমাকে পেয়ে অনেকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের কাউকে চিনি কাউকে চিনিনা। কিন্তু তাতে কি, মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা এই পরিবারের মানুষদেরও আছে।

বিরাট উঠান জুড়ে সব্জি আর ফুলের বাগান। সুধীর স্যারের বাগানের শাকসব্জী সিডনির বাঙালিদের অনেকের বাড়িতেই নিয়মিত পৌঁছে যায় সিজনাল উপহার হিসেবে। কচুর ফলন দেখে বুঝতে পারছি বেশ যত্ন করেই এবাগান গড়ে তোলা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি আর গবেষণার পরে যেটুকু সময় বাকী থাকে তার সবটাই সম্ভবত বাগানে দেন সুধীর স্যার। স্বপনদার এক কাপ চা খেয়ে চলে যাওয়া আর হলোনা। চায়ের আগে বীয়ার খাওয়া হলো। আমার বীয়ারও ভালো লাগে না শুনে একটু অবাক হলেও খুশি হলেন সুধীর স্যার। বললেন, 'তুমি ভাগ্যবান এব্যাপারে'।

সুধীর স্যার চমৎকার রাঁধুনী। একঘন্টার মধ্যে তৈরি করে ফেললেন পাঁচটা তরকারি। তরকারির সংখ্যা পাঁচ না হলে নাকি অতিথি আপ্যায়ন সম্পূর্ণ হয়না। আর অতিথি নাকি আমি, বাকী দুজন ঘরের মানুষ। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক, আরো মজার সব্জি, দুরকম মাছ , মাংস। মনে হচ্ছে সুধীর স্যারের হাতে রান্নার জাদু আছে। শ্যামলী ম্যাডাম আমাদের সাথে বসে গল্প করতে করতেই সুধীর স্যারের রান্না শেষ হয়ে গেলো। শ্যামলী ম্যাডাম সমরেশ মজুমদারের সাতকাহন পড়ছেন এখন। সেটা নিয়ে আলাপ হলো কিছুক্ষণ যে আলাপে আমিও যোগ দিতে পারলাম। ঘরের ভেতর একপর্যায়ে মনেই হচ্ছিলো না যে আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরের কোন দেশে আছি।

পরিচয় হলো পাপাই আর শর্মিলার সাথে। সুধীর স্যার আর শ্যামলী ম্যাডামের ছেলেমেয়ে। পাপাই আগামী বছর এইচ-এস-সি দেবে, আর শর্মিলা ক্লাস ফোরে এখন। বেশ প্রাণবন্ত ছেলেমেয়ে। সুধীর স্যারের একটা অফার এসেছে সিডনি ইউনিভার্সিটি থেকে। এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেখানে যাবেন নাকি এখানেই থাকবেন। এরকম সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় তো

লাগেই। সেই সময়টা নিচ্ছেন এখন সুধীর স্যার। ফিরে আসার সময় সুধীর স্যার আমাদের সাথে গাড়ি পর্যন্ত এলেন। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এদিকে নাকি খুব সুন্দর একটা বেলাভূমি আছে। সেটা না দেখে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলোনা। সামান্য একটু হাঁটলেই সাগরের পাড়। আবছা অন্ধকারে সাগর দেখতে দারুণ লাগছিলো। এখন জোয়ারের সময়। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পায়ের কাছে, আর অনেকক্ষণ ধরে তৃষ্ণার্ত বালি তা শুষে নিচ্ছে নিমেষেই। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। সাগরের সম্মোহনী শক্তির কাছে হয়তো আমরা কিছুক্ষণের জন্য পরাজয় বরণ করে নিয়েছি। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারার মেলা। চাঁদ নেই একটুও। তারার আলোতেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সামনের বিশাল সাগর। দিনের আলোর নীল পানি এখন কুচকুচে কালো। কেমন মন উদাস করে দেয়া একটা পরিবেশ। চলে এলাম একটু পরে। আমরা গাড়িতে আর সুধীর স্যার চললেন বাড়িতে।

গাড়িতে খুব একটা কথা হলো না আর। সবাই খুব টায়ার্ড বুঝতে পারছি। কেমন যেন ঘুম ঘুম লাগছে। কিন্তু কথা বলে স্বপনদাকে জাগিয়ে রাখা দরকার। গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়লে সাংঘাতিক বিপদে পড়তে হতে পারে। নীলিমাবৌদি ব্যাপারটা জানেন। কথার পিঠে কথা চালিয়ে নেবার মোক্ষম অস্ত্র হলো ঝগড়া করা। কিন্তু কী বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা যায়! ঝগড়া করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে বিষয় লাগেনা। তেলাপোকা দিয়ে শুরু করে তিমিমাছ দিয়ে শেষ করা যায় ঝগড়া। কিন্তু স্বপনদার সাথে খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না নীলিমা বৌদি। স্বপনদা কোন ভাবেই কোন প্রতিক্রিয়া দেখান না। মনে হচ্ছে স্বপনদা ঝগড়া প্রুফ। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা নেই। ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছে যাওয়াই উদ্দেশ্য এবং তা সফল হলো। সারাদিন জার্নিতে সবাই বেশ টায়ার্ড যে হয়েছি তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাসায় এসে টিভি খুলে জানতে পারলাম ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটা বিমান হাইজ্যাক করা হয়েছে।